খন্দকার জাহিদ হাসান

(ল) 'কবি সুকান্তের আইকনিক পোর্ট্রেট্'

[বাংলা সাহিত্যের ভূবনে ক্ষণজন্মা কাব্য-প্রতিভা আবুল হোসেন সত্তরের দশকের শেষভাগে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অসময়োচিত তিরোধানে সাহিত্যজগতে নেমে আসে শোকের ছায়া। কিন্তু ওদিকে পরপারে গমনের পর প্রয়াত কবি আবুল হোসেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কালজয়ী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের দর্শনলাভ করেন। নীচে তাঁদের কাল্পনিক কথোপকথনটি বর্ণিত হলো।]

আবুল হোসেনঃ (বিনীত কণ্ঠে) গুরুজী, বেঁচে থাকতে তো কখনও কল্পনাই করিনি যে, পরপারে আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বের সাথে এভাবে সাক্ষাতলাভের সৌভাগ্য হবে!

সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ (মৃদু হেসে) এভাবে 'গুরুজী' সম্বোধন ক'রে তুমি আর আমায় লজ্জা দিও না আবুল হোসেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে ও সম্বোধনটি পাওয়ার যোগ্যতা শুধুমাত্র একজনের-ই রয়েছে। তাই মিছেমিছি এভাবে....

আবুল হোসেনঃ (সামান্য বাধাচ্ছলে) আমি তো আর সেই আসন থেকে তাঁকে নড়াতে চাইছি না! আর সেই ধৃষ্টতা প্রদর্শনের যোগ্যতাও আমার নেই। তাঁকে তাঁর আসনে বহাল রেখেই আমি আপনাকে 'গুরুজী' ডাকতে চাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ তথাস্তু। তোমার মংগল হোক। তবে তুমি সবেমাত্র পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে এসেছো কিনা। এপারের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা নেহায়েত-ই কম। তাই এখন তোমার অবগতির জন্যই বলছিঃ (গলা নামিয়ে) এখানে বিনয়ে বিগলিত হওয়ার তেমন কোনো আবশ্যক নেই। এপারে আমরা সবাই সমান। সত্যিকারের সাম্যবাদ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পৃথিবীতে না থাকুক, কিন্তু এখানে রয়েছে। আর তাছাড়া পৃথিবীত্যাগের বয়সও আমার খুব-ই কম। মাত্র একুশ বছর! কল্পনা করতে পারো? সেদিক দিয়ে তুমি আমার চেয়ে কিছুটা হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ।

আবুল হোসেনঃ পৃথিবীর কথা বাদ দিন গুরুজী! ও জায়গাটা দ্রুত নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে। অশিষ্ট কদাচারের ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে ওখানকার সাহিত্যিক পরিমন্ডলও হোয়ে পড়ছে কলুষিত। মৃত্যুকালে আমাদের পার্থিব বয়সটাও তাই তুচ্ছ একটি বিষয়। আসলে জ্ঞান, কাব্যপ্রতিভা, প্রজ্ঞা, মানবপ্রেম– সবদিক দিয়েই আপনি অতূলনীয়। তাই আমি আমার কিশোর বয়স হতেই আপনার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত।

সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ (প্রসন্ন বদনে) আমাকে আর বিড়ম্বিত কোরো না আবুল হোসেন। তোমার কাব্যপ্রতিভাও আকাশচুম্বী। সাধারণ পাঠকের মাঝে তোমার তেমন পরিচিতি না থাকুক, কিন্তু আমরা যারা কবি– পৃথিবীর কিংবা এখানকার, তারা সবাই তোমাকে ভালো ক'রেই চিনি। তাই তো তোমার মৃত্যুর পরপর-ই সম্প্রতি কবি শামসুর রাহ্মান তোমাকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখেছেনঃ

"সবাই একদিন চলেই যায়,
তা বলে কি হঠাৎ ক'রে এভাবে চলে যেতে হয়?...."

আবুল হোসেনঃ তাই নাকি? জানতাম না তো!

সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ তুমি জানবে কিভাবে? সবে তো এপারে এসেছো। এখনও তোমার চিত্ত উদ্বেলিত। প্রশমিত হও। ধীরে ধীরে সব ঠিক হোয়ে যাবে। সব-ই জানতে পারবে।

.....ঠিক আছে, যা বলছিলাম। আমার কাব্যের কোন্ দিকটি তোমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে?

আবুল হোসেনঃ আধুনিকতা আর বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতা। আমার মতে, বাংলা কবিতায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক রীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আপনি অগ্রগণ্য। আর স্বচ্ছতা ও মানবপ্রেমের তো কোনো পরিমাপ-ই হয় না!

সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ যদিও এই মুহূর্ত ঠিক উপযুক্ত নয়, তবু জানতে ইচ্ছে করেঃ আমার কাব্যের আর কোন্ বিশেষত্ব তোমার কাছে প্রতিভাত হোয়েছে?

আবুল হোসেনঃ অতি অল্প সময়কালে রচিত আপনার অমূল্য সাহিত্যসম্ভার বাম রাজনীতিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হলেও তা শুধু 'বাম'-এর নিগড়ে আবদ্ধ থাকেনি। আপনার কবিতার রচনাশৈলীর ভেতর দিয়ে সততই এটি প্রকাশ পেয়ে এসেছে যে, আপনি আক্ষরিক অর্থেই আপনার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিনটি পর্যন্ত পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার সংগ্রাম ক'রে গেছেন। (সামান্য ভেবে নিয়ে) আর একটা কথা না বললেই নয়। আমার ক্ষুদ্র সাহিত্য-জীবনে যে জিনিসটি সার্বক্ষণিকভাবে আমার মনপ্রাণকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো, তা হলোঃ গন্ডদেশে হাতরাখা আপনার গভীর চিন্তামগ্ন অথচ স্মিত মুখাবয়বের সেই একটিমাত্র যুগান্তকারী চিত্র। আমার মনোজগতে এই ছবিটি এক বিশাল 'আইকন' হিসাবেই চিরকাল বিরাজ করবে। .....হে কবি, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

[কবি আবুল হোসেন চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কোথাও কেউ নেই। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য নিঃশব্দে কখন যেন বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু পাশেই রেখে গিয়েছেন তাঁর সেই কাল পরিভ্রমণকারী পোর্ট্রেটের একটি অনুলিপি। একটা ছোট্টো নিঃশ্বাস ফেলে আবুল হোসেন পরম শ্রদ্ধাভরে সেটি হাতে তুলে নিলেন। তারপর ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি ভাবতে থাকলেন পৃথিবীর অগণিত শেকড়হীন হতদরিদ্র মানুষের কথা। এক নিদারুণ ব্যর্থতার গ্লানি তাঁকে যেন মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে চাইলো। তবে সমস্যা হলোঃ সেই মুহূর্তে উক্ত স্থানে কোনো মাটি ছিলো না।]

(কল্পনা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে রচিত)

(শ) 'তমসা বুড়ীমার কেচ্ছা'

['তমসা' নামের আদ্যিকালের এক বৃদ্ধা সারাক্ষণ শুধু বক্‌বক্ ক'রে কথা বলে যেতেন। মানুষজনের সংগে তো বটেই, নিজেরও সংগে এবং জীবজন্তু, পাখপাখালী, পোকামাকড়- এমনকি গাছপালা ও জড়বস্তুর সংগেও হর-হামেশাই তাঁর কথাবার্তা হতো। আবার কারও কোনো কথা তাঁর মনঃপুত না হলে শাপ-শাপান্তও চলতো। আর বড্ডো কৃপণও ছিলেন তিনি। 'হাড়কিপ্‌টে' যাকে বলে আর কি! এক শীতের সকালে নাস্তা খেতে বসে উঠোনের দূর্বাঘাসের সংগেই তাঁর বক্‌বকানি আরম্ভ হোয়ে গেল।]

দূর্বাঘাসঃ সেকি গো বুড়ীমা! এত জায়গা থাকতে বসলে তো একেবারে আমাদের গায়ের উপর?

বুড়ীমাঃ তাতে অসুবিধাটা কোথায় শুনি?

দূর্বাঘাসঃ অসুবিধা নেই? সকালের সুন্দর রোদটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিলে না? একটা টুল কিনলেই তো পারো। নিদেনপক্ষে একটা মাদুর?

বুড়ীমাঃ (দু'দন্ড সময় নিয়ে) ওসব জিনিস কেনার পয়সা কি আর আমার আছে রে?

দূর্বাঘাসঃ তাহলে একটা চাটাই কিনলেই তো পারো।

বুড়ীমাঃ গন্ডমূর্খ আর কাকে বলে! চাটাই কিনলে তোরা সব আরও বেশী ক'রে চাপা পড়বি যে!!

দূর্বাঘাসঃ আমাদের উপর কেন, ঘরের মেঝেতে চাটাই পাতবে!? তাহলেই তো আর আমরা চাপা পড়বো না।

[তমসা বুড়ীমা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দিলো না দূর্বাঘাস।]

দূর্বাঘাসঃ সে যাকগে বুড়ীমা। ওসব কথা এখন থাক। তার চে' বরং এবার বলো, এত রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছোটা কি?

বুড়ীমাঃ কি আর খাবো? এই চা দিয়ে একটু রুটি খাচ্ছি। এ-রকম ঠান্ডায় চা আমার বড়ো ভালো লাগে!

দূর্বাঘাসঃ ও.... তাহলে 'চা দিয়ে রুটি' বলছো কেন? বলো 'রুটি দিয়ে চা'।

বুড়ীমাঃ ঐ এক-ই তো কথা হলো। (আবারও একটু থামার পর) কেন রে মুখপোড়ার দল, কতো বছর ধরে রোজ-ই তো তোরা এই জিনিস খেতে দেখছিস আমায়। তবে আজ যে আমার পেছনে লেগেছিস বড়ো?

দূর্বাঘাসঃ কে বলেছে তোমায় যে, অনেক বছর ধরে দেখছি? আমাদের আয়ু কি আর তোমাদের মত এত বেশী? আমরা গজালাম-ই তো এই সেদিন!

বুড়ীমাঃ আচ্ছা ঠিক আছে, ঘাট হোয়েছে আমার। এবারে একটু চুপ কর্।

দূর্বাঘাসঃ চুপ করবো কি গো! আসল কথাই তো জানা হয়নি এখনও।

বুড়ীমাঃ (উদ্বিগ্ন কন্ঠে) আসল কথা আবার কিরে?

দূর্বাঘাসঃ আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো দেখি। তুমি কি সবসময় চা দিয়েই রুটি খাও নাকি? সেমাই, হালুয়া, কিংবা ডিমভাজি, আলুভাজি দিয়ে খাও না কখনও?

বুড়ীমাঃ ওরেব্বাবা, বলে কি ডাকাতগুলো! সেমাই-হালুয়া খাওয়া কি মুখের কথা নাকি? (একটু ভেবে নিয়ে) তবে হ্যাঁ, 'খাই না' বললেও ভুল বলা হবে। খাই-ই তো! সেমাই খাই দুই ঈদে, আর হালুয়া-রুটি চলে শবে বরাতে। (একটু সামলে নিয়ে) তো তোরা এতসব খবর রাখিস কি ক'রে? সামান্য দূর্বাঘাস হোয়ে সেমাই-হালুয়ার খবর রাখা কি চাট্টিখানি কথা নাকি?

দূর্বাঘাসঃ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আজ না হয় ঘাস হোয়ে জন্মেছি গো বুড়ীমা! আর জন্মে তো আমরা মানুষ-ই ছিলাম। (গলা নামিয়ে) তবে এই বেলা একটা কথা বলি তোমাকে। আমাদের মা-বাবা কিন্তু তোমার মত এত কিপ্‌টে ছিলো না। সেমাই-সন্দেশ আর হালুয়া-পুরী প্রায়-ই খাওয়া হতো আমাদের।

বুড়ীমাঃ (রাগতঃস্বরে) দ্যাখ্ হারামীর পাল, বেশী প্যাটর প্যাটর করলে গায়ে তোদের গরম পানি ঢেলে দেবো কিন্তু, হ্যাঁ.....!

[আরেকদিন দুপুরবেলা তমসা বুড়ী খেতে বসেছেন। দু'টো কাক উঠোনে বসে ছিলো। হঠাৎ তারা হেঁড়ে স্বরে কথা বলতে শুরু করলো।]

কাকেরাঃ বুড়ীমা, বুড়ীমা! এতদিনে তাহলে সুবুদ্ধি হলো তোমার? রোজ তো শাক-পাতা খেয়ে খেয়ে আত্মাটাকে কষ্ট দাও। আজ যে ডিমের তরকারী রেঁধেছো গো!

বুড়ীমাঃ (কিছুটা লজ্জিতকন্ঠে) ডিম পাবো কোথায় বাছা? আজ একটু গাছের আমড়ার ঝোল রেঁধেছি। ও-গুলোই ডিমের মত দেখাচ্ছে।

কাকেরাঃ (তাচ্ছিল্যভরে) আমড়া? ছ্যা-ছ্যা!! আমড়ার আবার তরকারী, তাও ফের খেতে বসেছো নবাবী চালে! দেখে তো মনে হচ্ছে, বাদশাহী খাবার খাচ্ছো। কি দিনকাল এলোরে বাবা!

বুড়ীমাঃ (গলা চড়িয়ে) এ্যায় কালাকুষ্ঠির দল, এখান থেকে গেলি? নইলে কুকুর লেলিয়ে দেবো কিন্তু, হ্যাঁ....!!!

[হঠাৎ কাছে বসা পোষা বিড়ালটা মুখ খুললো। তমসা বুড়ীমা গভীর দুঃখের সংগে লক্ষ্য করলেন যে, এই বদমাশটাও তাঁর সাথে বেঈমানী শুরু কোরেছে।]

বিড়ালঃ ও বুড়ীমা, কাকদেরকে আর তোমার ঐ নেড়ীকুত্তাটার ভয় দেখিও না। ওদের ডানা রয়েছে। কোথায় উড়ে চলে যাবে!

বুড়ীমাঃ এ্যায় মীরজাফর, বেশী বেশী খেয়ে তেল হোয়েছে তোর, না? চুপ থাক্।

বিড়ালঃ তুমিই চুপ থাকো। যে ভারী খেতে দাও আমায়! সারাটা দিন তো তুমিই গেলো। রাতেও বাদ যায় না। কাল রাতে দেখলাম মাঝরাত পর্যন্ত চালালে।

বুড়ীমাঃ কাল রাতে তো আম খেয়েছি। তুই আবার আম খাস্ নাকি যে, লোভ দিচ্ছিস্ বড়ো?

বিড়ালঃ আমায় দিয়েই দ্যাখো, আম আমি খাই কিনা!

বুড়ীমাঃ হায়রে কপাল! রাতের আঁধারে দু'টো পচা আম খেয়েছি। আর তাই কিনা তুই আমাকেও হিংসে করতে শুরু কোরেছিস্? আমি তোর মনিব না? তোর জাতধর্ম বলে কিছু নেই নাকি?

বিড়ালঃ মিছে কথা বোলো না বুড়ীমা। কাল রাতে তুমি কম ক'রে হলেও বিশটা আম পেটে চালান দিয়েছো, তাও আবার পোকাশুদ্ধ!

বুড়ীমাঃ পোকাশুদ্ধ মানে? তুই দেখলি কি ক'রে ঐ আঁধারে?

বিড়ালঃ দেখবো না কেন? আমরা যে বেড়াল গো!....তবে বলিহারি বুদ্ধি তোমার! অমন ঘুট্ঘুটে আঁধারে বসে কেউ খাওয়াদাওয়া করে?

বুড়ীমাঃ (কাঁচুমাচু গলায়) কি আর করবো বল্? আসলে আমিও কিন্তু জানতাম যে, আমগুলোতে পোকা ছিলো। তবে আলোতে সেগুলো দেখতে পেলে খেতে কি রুচি হতো আমার, তুই-ই বল্? তাই তো আমায় অমন আঁধারে খেতে হোয়েছে।

[এতক্ষণ চুপচাপ বসে কাক দু'টো তমসা বুড়ীমা আর বিড়ালের কথাবার্তা শুনছিলো। এইবার তারা খা-খা ক'রে হেসে উঠলো।]

কাকেরাঃ হায়রে পোকাখেকো কিপ্টে বুড়ী! কেবল আমরা পোকামাকড় খেলেই দোষ হয়? তোমরা খেলে হয় না? এবার নিজের গুমর তুমি নিজেই ফাঁক করলে। হাঃ হাঃ হাঃ.....

[এতক্ষণে কাক দু'টো উড়াল দিলো। উড়তে উড়তে তারা বলতে থাকলো, "কিপ্টে বুড়ী! কিপ্টে বুড়ী!! পোকাখেকো বুড়ী!!!....."]

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৬/০৭/২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন